ইসলামী আন্দোলনের পথে
আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার
উপযুক্ত হওয়াই

আমাদের কাজ

মকবুল আহমাদ

ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ

মকবুল আহমাদ

ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ

মকবুল আহমাদ

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ

- মকবুল আহমাদ

প্রকাশক ঃ আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান
প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট - ২০১৩
ভাদ্র - ১৪২০
শাওয়াল - ১৪৩৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। শাসক গোষ্ঠীর সীমাহীন দমন পিপীড়নে ইসলাম প্রিয় জনতা আজ উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের উপর সরকার নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আন্দোলনের প্রতিটি নেতাকর্মীকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ময়দানে টিকে থাকতে হবে।

পৃথিবীতে এমন কোন নবী-রাসূল আসেননি যাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়নি। সকল যুগেই হকের সাথে বাতিলের সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু বাতিলের কোন ষড়যন্ত্রই ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। রাসূল (সা.) এর যুগে ইসলামী আন্দোলনের পুরো ইমারতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল সাহাবীদের শাহাদাতের খুন-জুলুম, নির্যাতনের উপর ভিত্তি করে। নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত হচ্ছে বিধায় এ আন্দোলনও বাতিল শক্তির প্রধানতম টার্গেটে পরিণত হয়েছে। জামায়াতের উপর চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নজিরবিহীন তান্ডব। এই প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্দেশ করতে গিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমাদ সাহেবের এই লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল যা গত ১১ জানুয়ারী ২০১৩ হতে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় "ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ" নামে ছাপা হয়েছিল। আশা করি বইটি পাঠে পাঠক/পাঠিকা সমাজ উপকৃত হবেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ

যুগে যুগে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জমিনে তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন নবী রাসূলগণ। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন খাতাম্মুন নাবীয়্যিন আর আমরা হচ্ছি তাঁর উম্মত। একদিকে যেমন মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে আমাদের রয়েছে অনেক মর্যাদা তেমনি নবী রাসূলগণ যে দায়িত্ব পালন করেছেন সে কঠিন দায়িত্ব আজ উম্মতে মুসলিমার উপর অর্পিত। মুসলমানরা আজ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে যাওয়ার কারণে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে অশান্তি, অনাচার, দুরাচার আর অরাজকতা। আর এই বিপর্যয় সৃষ্টি করছে কতিপয় মানুষ যার শীর্ষে রয়েছে শাসক গোষ্ঠী। তারা তাদের মনগড়া নিজস্ব মত, পথ, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা দুনিয়ায় মানব রচিত মতাদর্শ কায়েমের মাধ্যমে শ্বাসত বিধান আল-ইসলাম থেকে মানুষকে ফিরাতে চায়। কিন্তু যারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উলুহিয়াত ও রাবুবিয়াতকে এই জমিনে কায়েম করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্ঠা চালায় তাদের সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের লড়াই অবধারিত। এই লড়াই যুগে যুগে নবী রাসূলদের সাথেও হয়েছে। জুলুম, নির্যাতন, অপপ্রচার, কারাবরণ, দেশান্তর এমনকি শাহাদাতের মতো ঘটনাও সংঘঠিত হয়েছে তাদের জীবনে। এটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। সুতরাং যারাই এই পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের উপর জুলুম, নির্যাতন, অপপ্রচার, কারাবরণ, দেশান্তর তথা শাহাদাতের মতো ঘটনাও ঘটেছিল। এই সব কিছুর মধ্যে বিরোধীদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই জমিন থেকে চিরতরে দ্বীনের মুলোৎপাটন করা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী এই কাজে বাতিলরা কখনও সফল হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ।

সীমাহীন যুলুম নিপীড়ন ও অত্যাচার সত্তেও ঈমানদারগণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে যায় দ্বিধাহীন চিত্তে। কাংখিত মনজিলে পৌছার অদম্য স্পৃহায় তারা এগিয়ে চলে। কোন বাধাই তাদের চলার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর যুলম ও নির্যাতন

পৃথিবীতে এমন কোনো নবী রাসূল (সা.) আসেনি যাদের উপর জুলুম নির্যাতন চালানো হয়নি। প্রত্যেকেই এ জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর চালানো হয়েছিল অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালিগালাজ ও অপপ্রচারাভিযানের সাথে সাথে কোরাইশদের উন্মত্ত বিরোধিতা ক্রমশ গুণ্ডামি, সন্ত্রাস ও সহিংসতার রূপ নিত।

বিরোধীরা মূর্খ ও বখাটে লোকদের উস্কিয়ে দিতে। তাঁকে কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে অপবাদ দিতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসার করার কাজে অবিচল থাকলেন, প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন–

"একদিন যখন কুরাইশ সরদারগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হয়েছে,তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললো, 'এই লোকটার ব্যাপারে আমরা যতটা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছি তা নজিরবিহীন। সে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে এবং আমাদের দেবদেবীকে গালাগালি করেছে। অত্যন্ত নাজুক ও মারাত্মক ব্যাপারে আমরা তাকে সহ্য করেছি'। এভাবে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকাকালে সহসা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তিনি কা'বা তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করলো।

তাওয়াফ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলেন। পরদিন আবার সবাই একই স্থানে সমবেত হলো, আমিও সেখানে ছিলাম। তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'দেখ তো! মুহাম্মদ কতদূর বেড়েছে এবং সে কতদূর ধৃষ্টতা দেখালো। তোমরা যে কথা একেবারেই পছন্দ কর না তা সে তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল। আর তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে।'

একদিন একযোগে তাঁর ওপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবাই তাঁকে ঘেরাও করে বলতে থাকলো, 'তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলে থাকো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই ঐসব কথা বলে থাকি।' আমি দেখলাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা.) তাঁর গলার ওপরের চাদরের দু'পাশ ধরে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সেই মুহূর্তে হজরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে বাধা দিলেন। তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'একটি লোক আল্লাহকে নিজের রব বলে ঘোষণা করেছে, এই কারণেই কি তোমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।'

এরপর জনতা সেখান থেকে চলে গেল। সেদিন আমি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরাইশদের যেরূপ মারাত্মক আক্রমণ দেখেছি, তেমন আর কখনও দেখিনি।"

শুধু তাই নয় তারা রাসূলুলাহ (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য মহল্লার অধিবাসী বড় বড় মোড়ল ও গোত্রপতি তাঁর পথে নিয়মিতভাবে কাঁটা বিছাতো, তাঁর নামাজ পড়ার সময় ঠাট্টা ও হৈ-চৈ করতো, সিজদার সময় তাঁর পিঠের ওপর জবাই করা পশুর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করতো, চাদর পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিত, মহল্লার বালক-বালিকাদেরকে হাতে তালি দেয়া ও হৈ-হুল্লোর করে বেড়ানোর জন্য লেলিয়ে দিত এবং কুরআন পড়ার সময় হৈচৈ, কুরআনকে এবং আল্লাহকে গালি দিত।

এ অপকর্মে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিল আবু লাহাব ও তার স্ত্রী। এ মহিলা এক নাগাড়ে কয়েক বছর পর্যন্ত মুহম্মদ (সা.) এর পথে ময়লা আবর্জনা ও কাঁটা ফেলতো। রাসূল (সা.) প্রতিদিন অতি কষ্টে পথ পরিষ্কার করতেন। এই হতভাগী তাঁকে এত উত্ত্যক্ত করেছিল যে, তাঁর সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তায়ালা আলাদাভাবে সূরা লাহাব নাজিল করেন এবং তাতে ঐ দুর্বৃত্ত দম্পতির ঠিকানা যে দোজখে, তা জানিয়ে দেন।*

রাসূল (সা.)-এর কারাবরণ

আজকের মুসলমানদের জন্যে রাসূল (সা.)-এর কারাবরণের এই সুন্নাত কতই না গৌরবের যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের আন্দোলনের সফলতা তাদেরকে বেপরওয়া ও দিশেহারা করে ফেলেছে। ফলে বয়কট ও আটকাবস্থা সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুরা তাদের সকল ফন্দি-ফিকিরের ব্যর্থতা, ইসলামের অগ্রগতির ও বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য দেখে দিশাহরা হয়ে ওঠে।'

* মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ)-নঈম সিদ্দিকী।

'নবুওয়তের সপ্তম বছরের মহররম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম গোত্রকে বয়কট করার চুক্তি সম্পাদন করলো। চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, বনু হাশেম যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা.) কে আমাদের হাতে সমর্পণ না করবে এবং তাকে হত্যা করার অধিকার না দেবে, ততক্ষণ কেউ তাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা রাখবে না, বিয়ে শাদির সম্পর্ক পাতাবে না, লেনদেন ও মেলামেশা করবে না এবং কোনো খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য তাদের কাছে পৌঁছাতে দেবে না। গোত্রীয় ব্যবস্থায় এ সিদ্ধান্তটা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপ। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র অসহায় অবস্থায় 'শিয়াবে আবু তালেব' নামক উপত্যকায় আটক হয়ে গেল। এই আটকাবস্থার মেয়াদ প্রায় তিন বছর দীর্ঘ হয়। এই সময় তাদের যে দুর্দশার মধ্য দিয়ে কাটে তার বিবরণ পড়লে পাষাণও গলে যায়। বনু হাশেমের লোকেরা গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়ে এবং শুকনো চামড়া সিদ্ধ করে ও আগুনে ভেজে খেতে থাকে। অবস্থা এত দূর গড়ায় যে, বনু হাশেম গোত্রের নিষ্পাপ শিশু যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদতো, তখন বহু দূর পর্যন্ত তার মর্মভেদী শব্দ শোনা যেত। কোরাইশরা এসব কান্নার শব্দ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত"।*

তায়েফে ইসলামের দাওয়াত ও নির্যাতন

বিশ্বমানবতার পরম বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে তায়েফবাসী পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ করেছিল। তারা তাদের শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখাটে তরুণদেরকে, চাকর নকর ও গোলামদেরকে রাসূলের (সা.) পেছনে লেলিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, যাও, এই লোকটাকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।' বখাটে যুবকদের এক বিরাট দল আগে-পিছে গালি দিতে দিতে, হৈচৈ করতে করতে ও পাথর ছুড়ে মারতে মারতে চলতে লাগলো। তারা তাঁর হাঁটু লক্ষ্য করে পাথর মারতে লাগলো, যাতে তিনি বেশি ব্যথা পান। পাথরের আঘাতে আঘাতে এক একবার তিনি অচল হয়ে বসে পড়ছিলেন। কিন্তু তায়েফের গুণ্ডারা তার বাহু টেনে ধরে দাঁড় করাচ্ছিল এবং পুনরায় হাঁটুতে পাথর মেরে হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। ক্ষতস্থানগুলো থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছিল। এভাবে জুতোর ভেতর ও বাইরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

---

* মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) - নঈম সিদ্দিকী।

নির্যাতনের চোটে অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার পর যিনি রাসূল (সা.) কে ঘাড়ে করে শহরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন, সেই যায়েদ বিন হারেসা ব্যথিত হৃদয়ে বললেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন।

রাসূল (সা.) বললেন, "আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন বদদোয়া করবো? ওরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান নাও আনে, তবে আশা করা যায়, তাদের পরবর্তী বংশধর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে।"

এই সফরকালেই জিবরাইল (আ.) এসে বলেন, পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা আপনার কাছে উপস্থিত। আপনি ইঙ্গিত করলেই তারা ঐ পাহাড় দুটোকে এক সাথে যুক্ত করে দেবে, যার মাঝখানে মক্কা ও তায়েফ অবস্থিত। এতে উভয় শহর পিষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানবতার বন্ধু মহান নবী (সা.) এতে সম্মত হননি।

এহেন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই জিনেরা এসে রাসূল (সা.) এর কুরআন তেলাওয়াত শোনে এবং তাঁর সামনে ঈমান আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) কে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষও যদি ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার সৃষ্ট জগতে এমন বহু জীব আছে, যারা আপনার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার

সকল যুগেই সত্যের পথিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। কিন্তু কোনো রকম অত্যাচার চালিয়ে বাতিলেরা সফল হতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে যখন কোনো দিক দিয়েই হামলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ পাওয়া যায়না, তখন শয়তান তাকে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার প্ররোচনা দেয়। আর শয়তানের দৃষ্টিতে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, এর নেতার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ওপর কলংক লেপন করা। এ জন্যেই এক পর্যায়ে ক্ষমতার মোহ এবং স্বার্থপরতার জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে। এরপর অপপ্রচারণার এই ধারা আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। আর এই পরিবারের কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানাই ছিল ঐ অবকাঠামোকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শেষ পর্যন্ত নাশকতাবাদী শক্তি এই শেষ আঘাতটা হানতেও

দ্বিধা করলোনা। এই বৈরী আঘাতের মর্মন্তুদ কাহিনী কুরআন, হাদিস, ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থাবলীতে 'ইফকের ঘটনা' তথা 'হযরত আয়েশার (রা.) বিরুদ্ধে অপবাদের কাহিনী' নামে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

রাসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

কোনো ষড়যন্ত্রেই যখন এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি তখন তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ ধরনের কুচক্রী শত্রুরা যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গদিতে আসীন হয়, তাহলে তারা প্রতিপক্ষের ওপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালায় এবং আইনের তরবারী চালিয়ে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ করে মানবতার সেবকদের হত্যা করে। আর ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, তারা সরাসরি হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক পথই বেছে নেয়। মক্কার জাহেলী নেতৃত্ব এই শেষোক্ত পথই বেছে নিল।

হিজরী চতুর্থ সালের কথা। আমর বিন উমাইয়া যামরী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করলো। রাসূল (সা.) এই হত্যাকাণ্ডের দিয়ত আদায় করা ও শান্তি চুক্তির দায়দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বনু নাযীর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকেরা রাসূল (সা.)-কে একটা দেয়ালের ছায়ার নিচে বসালো। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করতে লাগলো যে, একজন উপরে গিয়ে মহানবী (সা.) এর মাথার ওপর বিরাটকায় পাথর ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। আমর বিন জাহ্হাশ বিন কা'ব এই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। রাসূল (সা.) তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে আগে ভাগেই উঠে চলে এলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)

যুগে যুগে জুলুম- নির্যাতন ও শাহাদাত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইসলামী আন্দোলনের পুরো ইমারতের ভিত্তি রচিত হয়েছে সাহাবীদের শাহাদাতের খুন জুলুম নির্যাতন এর উপর ভিত্তি করে। রাসূলে কারীম (সা.)-এর সাহাবাগণ নানা ধরনের জুলুম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। হযরত বেলাল (রা.)-এর উপর কী অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল! প্রচণ্ড গরম বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল। তবুও তিনি আহাদ আহাদ বন্ধ করেননি। হযরত আবূযার (রা.)-কে ঈমান আনার কারণেই রক্তাক্ত হতে হয়েছে। হযরত আমের বিন ফাহিরার শরীর কাটা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে। এধরনের নির্যাতনে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। আল্লাহর

কুদরতে পরে আবার দৃষ্টি ফিরে পান। হযরত খাব্বাব (রা.)কে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হত। ফলে তার গায়ের চর্বিতে আগুন নিভে যেত। হযরত আমের (রা.)-কে পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতন করা হয়। তাঁর মা হযরত সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয়। তার পিতা হযরত ইয়াসীর ও ভাই আবদুল্লাহ নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত যায়েদ বিন দাসানাকে বলা হয়, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে শূলে চড়ালে তুমি কি সহ্য করবে? তিনি জবাব দেন তাঁকে শূলে চড়ানোতো দূরের কথা তার পায়ে সামান্য কাঁটার আঘাত ও সহ্য করব না। এ কথা শোনার পর তার উপর অবর্ননীয় নির্যাতন করা হয়। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। হামজার (রা.) কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। এভাবে অসংখ্য সাহাবীকে অবর্ননীয় নির্যাতন সহ্য করে দ্বীনের পথে চলতে হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছিলো তাদের ওপর মুশরিকরা ভীষণ অত্যাচার চালাতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র মুসলমানদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তাদেরকে সত্যের পথ থেকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি। সাহাবায়ে কিরামের ওপর যে জুলুম নির্যাতন হয়েছে এতে তাদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মর্যাদার সেই চিত্রটি আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এ ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত।" (সূরা বাকারাহ - ১৫৪)

কুরআনে বর্ণিত আছে "এটা হচ্ছে তোমাদের করনীয় কাজ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের সাথে বুঝাপড়া করতেন। কিন্তু (তিনি এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এ জন্য) যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ কখনো তদের আমলসমূহ ধ্বংস করবেন না। তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন।" (সূরা মুহাম্মদ - ৪-৬)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, "জবাবে তাদের রব বলেন আমি তোমাদের কারো কর্মকাণ্ড নষ্ট করবো না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তরভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া

হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবো যার নিচে দিয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লহর কাছেই আছে।" (সূরা আল ইমরান - ১৯৫)

এই জুলুম নির্যাতনের কারণ অন্য কিছুই ছিল না আল্লাহ বলেন, 'ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শক্রতার এ ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।" (সূরা আল বুরুজ- ৮-৯)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য। তাদের জন্য রয়েছে পুরষ্কার ও নূর। আর যারা কুফুরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা।" (সূরা আল হাদীদ - ১৯)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, জিহাদ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে প্রিয় নবী করীম (সা.) বলেন, "সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার মন তো চায় আল্লাহর পথে আমি শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই এবং আবার শহীদ হই।" (সহিহুল বুখারী, মুসলিম)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, আমাদের মহান আল্লাহ সে ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পরাজয় বরণ করলেও নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে ফিরে দাঁড়ায় এবং আমৃত্যু লড়াই করে। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমার পুরস্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে সে পুনরায় জিহাদে লিপ্ত হয়েছে শেষ পর্যন্ত নিজের জান দিয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।" (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একজন সাহাবী কোনো এক স্থান অতিক্রম করছিলেন, সেখানে একটি নহর ছিল। তিনি নহরটি পছন্দ করলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, এ জায়গায় একাকী বসে ইবাদাত করলে কতই না ভালো হতো। তিনি তাঁর ইচ্ছা নবী কারীম (সা.)-এর কাছে ব্যক্ত করলেন।

হুজুর (সা.) বললেন, তা করবে না। তোমাদের পক্ষে ঘরে বসে সত্তর বছর নামাজে কাটানোর চেয়ে আল্লাহর পথে বের হওয়া অধিক উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং বেহেশতে স্থান দান করুন। আল্লাহর পথে জিহাদ কর– যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (তিরমিজি)

হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, 'তিনি হুজুর (সা.) এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর (সা.) জবাব দিলেন, হারেসার মা। বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।' (সহিহুল বুখারী)

চিন্তা করে দেখুন জান্নাতের চিন্তা কিভাবে তাঁদেরকে প্রাণপ্রিয় পুত্রের শোক পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়।

হযরত মিকদাদ বিন মাদকারব থেকে বর্ণিত, ''রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য। প্রথম আক্রমণেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থাতেই তাকে বেহেশতের ঠিকানা জানিয়ে দেয়া হয়, কবর আজাব থেকে তার নাজাত হয়, কিয়ামতের ভয়াবহ আতঙ্ক থেকে সে নিরাপদ থাকবে, তাকে ইয়াকুত খচিত একটি সম্মানিত টুপি পরিধান করানো হবে, যা সারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে, মৃগ-নয়না হুরেরা তার স্ত্রী হবে এবং সে সত্তর জন আত্মীয়ের জন্য শাফায়াত করবে।" (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহর মেহমান তো কেবল তিনজন, গাজী, হাজী ও ওমরা সম্পাদনকারী।" (মুসলিম)

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, শহীদ তার বংশের সত্তর ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করবে।' (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মরে গেল, অথচ সে জিহাদ করেনি বা তার মনে জিহাদের জন্য কোনো চিন্তা, সঙ্কল্প বা ইচ্ছাও দেখা যায়নি তবে সে মুনাফিকের ন্যায় মারা গেল।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

সাহাবীদের উপর জুলুম নির্যাতন

হযরত খুবাইব রা.

খুবাইব (রা.)-এর হস্তদ্বয় পিচমোড়া করে বেধে মক্কার নারী পুরুষরা তাকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যায়। কাফেররা করতালি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডকে যেন উৎসবে পরিণত করে। কিন্তু তাদের নির্মম নির্যাতনে তিনি ব্যাকুল হননি। ফাঁসির মঞ্চে বসার আগে তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে দু'রাকাআত নামাজ আদায় করার সুযোগ দাও অতঃপর হত্যা কর। তারা নামাজ আদায়ের সুযোগ দিল। খুবাইব (রা.) খুব অল্প সময়ে নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ তোমরা যদি এ ধারনা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি তাহলে আমি আরও বেশি নামাজ আদায় করতাম। নামাজ আদায়ের পর জীবিত অবস্থায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর বলে, তুমি কি চাও, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করি? রাসূল প্রেমিক খুবাইব এই করুন অবস্থায় উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর রাসূল (সা.)-এর গায়ে কাটার আচর লাগবে তা হতে পারে না। তারা চিৎকার করে বলে উঠল তাকে হত্যা কর তাকে হত্যা কর। সাথে সাথে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন্ত খুবাইব (রা.) এর উপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়ল কাফিররা। তীর বর্শা আর খঞ্জরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের মুহূর্তে কালেমা শাহাদাত পড়ছিলেন আর বলছিলেন হে আল্লাহ এদের শক্তি ও প্রতিপত্তি ধ্বংস কর কাউকে ক্ষমা করো না।

হযরত খাব্বাব (রা.)

প্রাথমিক স্তরের ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় হযরত খাব্বাব (রা.) যেমন ৫-৬ জনের একজন, তেমনি ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায়ও তিনি ছিলেন অন্যতম। হৃদয়বিদারক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছিল তাঁর ওপর। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে লোহার করা পরিয়ে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখা হতো আর উত্তাপে খাব্বাবের কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত।

হযরত খাব্বাব মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে একথা শুনে তাঁর মনিব জনৈকা মহিলা লোহার শলাকা গরম করে খাব্বাবের মাথায় দাগ দিতে লাগল।

এতেও খাব্বাবকে বিচলিত করা যাচ্ছে না বিধায় একদিন কোরাইশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অঙ্গার বিছিয়ে তার ওপর খাব্বাবকে চিৎ করে শায়িত করলো এবং কতিপয় পাষণ্ড তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরলো। অঙ্গারগুলো তার পিঠের গোশত-চর্বি পুড়তে পুড়তে এক সময় নিভে যেত। তবুও নরাধমরা তাকে ছাড়ত না। এভাবে তার শরীরে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) তার এই নির্যাতনের চিহ্ন যাতে কেউ না দেখে সে জন্য চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন। একদিন হযরত ওমর (রা.) তার শরীর দেখে বললেন, হে ভাই খাব্বাব তোমার শরীরে এমন বড় বড় গর্তগুলো কিসের? হজরত খাব্বাব (রা.) বললেন, আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে ধরে রাখা হতো, আর আমার শরীরের রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেত।

হযরত মুসআব (রা.)-এর শাহাদাত

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম (সা.)-কে হত্যা করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের (সা.) দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাশত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফির বাহিনী শাণিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারি নিয়ে রাসূলকে (সা.) নিজের পেছনে রেখে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। কাফিরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো কাফিরদের দৃষ্টি রাসূলের (সা.) ওপর থেকে সরিয়ে তাঁর নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল (সা.) যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব (রা) ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফিরদের সামনে ঢালের মতোই ভূমিকা পালন করেছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর নবীকে (সা.) আক্রমণ করছিল। শত্রুদের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব একাই শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে (সা.) আঘাতকারী জালিম

ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব রাদিয়াআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারি দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কাফিরদের তরবারির আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের আরেকটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীয়মান রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

দাফন-কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়াআলা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো তাঁর নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শত ছিন্ন জামা। সে জামাও রক্ত আর বালুতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) হজরত মুসআবের (রা.) এই অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের (সা.) চোখে পানি ঝরতে দেখে সহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মতো ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। পরে কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে ঘাস দিয়ে পা ঢেকে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মতো জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন-সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের (সা.) সাথী হয়েছিলেন। হজরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত সুদর্শন ও বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল

ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম (সা.) ইসলামের প্রথম দূত হিসেবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই।

হযরত আবূযর (রা.)

আবূযর (রা.) ইসলাম কবুল করার পর চুপ করে বসে থাকার পরিবর্তে কাবা ঘরে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল। এ ঘোষণা দেয়ার পর কুরাইশরা হিংস্র পশুর মতো আবূযরের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। সবাই তাকে চারিদিক থেকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। আঘাতে আঘাতে তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হলো। রক্তে কাপড় চোপড় ভিজে গেল। এভাবে শুধু একবার নয় বারবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু আবূযর (রা.) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কিছুই মেনে নিয়েছেন হাসি মুখে।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ

আবূ উবায়দা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহনকারীদের অন্যতম। আবূবকর সিদ্দীক (রা.) ইসলাম গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে তারই প্রচেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ উবায়দা (রা.)-এর মাক্কী জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই অগ্নিপরীক্ষার এক দুর্বিষহ জীবন। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যসব সাহাবীদের মতো তিনিও আর্থিক সংকট, দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। কিন্ত আবূ উবায়দা (রা.) এর ঈমানী পরীক্ষা ইতিহাসে আদর্শের যে কোনো অনুসারীরর বিচারে এক বিরল ঘটনা। প্রতিটি ঈমানী পরীক্ষাতেই তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর আদর্শকে সমুন্নত করেছেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধে তাঁর অকল্পনীয় ঈমানী পরীক্ষা অতীতের সব পরীক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছে।

বদর প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে আবূ উবায়দা (রা.) মৃত্যুর পরওয়া না করে প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুবাহিনীর দুর্ভেদ্য বূহ্যকে ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হন।

এতে মুশরিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে যায়। এ সুযোগে আবূ উবায়দা (রা.) জীবনের ঝুকি উপেক্ষা করে শত্রুবাহিনীকে ধরাশায়ী করতে করতে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন ও তার চর্তুদিকে ঘুরে ফিরে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। কুরাইশ বাহিনীও বার বার তাকে প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এরই ফাকে শত্রুবাাহিনীর বুহ্য থেকে এক ব্যক্তি আবূ উবায়দাকে (রা.) বার বার চ্যালেঞ্জ করছিল। তিনিও আক্রমণের গতি পরিবর্তন করে প্রতিবারই তার সে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ উবায়দা (রা.) এ দুর্বলতার এক সুযোগে হঠাৎ সে তাঁর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে বসল। তিনি তড়িৎ গতিতে পাশ কাটিয়ে গেলে অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন। সে আবূ উবায়দার (রা.) সামনে বাধা হয়ে দাড়িয়ে শত্রু নিধনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াচ্ছিল। ধৈর্যহীনতার চরম পর্যায়ে আবূ উবায়দার (রা.) তরবারি প্রচণ্ড এক আঘাতে তার শির দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রিয় পাঠক! ভুলুণ্ঠিত এ ব্যক্তি কে? পূর্বেই আলোচনা করেছি, আবূ উবায়দার (রা.) ঈমান সর্বকালের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় এমন ভাবে উত্তীর্ণ যে, তা কোনো কল্পনাকারীর কল্পনারও উর্ধ্বে। স্তম্ভিত হবেন,ভুলুণ্ঠিত ব্যক্তির পরিচয়ে। সে আর কেউ নয়, সে হলো আবূ উবায়দার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ। এ ক্ষেত্রে আবূ উবায়দা (রা.) তার পিতাকে হত্যা করেননি। তিনি হত্যা করেছেন, পিতার অবয়বে শিরকের প্রতিমূর্তিকে। মহান আল্লাহ তাঁর ও পিতার মাঝে সংগঠিত এ ঘটনা সম্পর্কে আল কুরানের আয়াত নাযিল করলেন।

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরূদ্ধচারীদেরকে হোক না এই বিরুদ্ধচারীদের পিতা, পুত্র ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা। এদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

হযরত বারা'আ ইবনে মালেক (রা.)

হযরত বারা'আ ইবনে মালেক (রা.) তার বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন:

হে আনসার ভাইয়েরা কখনো আপনারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। এই মুহূর্ত হতেই আপনাদের জন্য আর মদীনা নয়; আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাওহীদের বাণীকে চির সমুন্নত করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হোন।

এই বলে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। বারা'আ ইবনে মালেক (রা.) দক্ষতার সাথে দু'ধারী তরবারি চালিয়ে তার দু'পার্শ্বের দুশমনদের ধরাশায়ী করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের যোদ্ধাদের শিরচ্ছেদ করতে করতে তিনি এক অবিস্মরনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এ আঘাতে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও তার বাহিনীর মধ্যে হঠাৎ ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা যুদ্ধ ময়দান সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। যে বাগানটি পরবর্তী সময়ে অগনিত মৃতদেহের স্তুপের কারণে 'হাদীকাতুল মাউত' বা লাশের বাগান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বাগানটি উচু ও প্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে প্রাণ রক্ষার জন্যে মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারী যোদ্ধারা এ বাগানে আশ্রয় নিয়ে দ্রুত এর একমাত্র গেইটটি বন্ধ করে দেয়। এভাবে নিজেরা নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে তার ভিতর হতে মুসলমান বাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ শুরু করে। এতে মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় আবার অনিশ্চয়তার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের পক্ষে তাদের মোকাবিলা করার সমস্ত পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বীর সিপাহসালার হযরত বারা'আ ইবনে মালেক (রা.) যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতি এক চরম ও ও শেষ আঘাত হানার জন্যে পরিকল্পনা নেন। তিনি তৎক্ষণাত একটি ঢাল সংগ্রহ করে তাঁর বাহিনীর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন:

আমি এ ঢ়ালের উপরে বসে পড়ি, তোমরা আমাকে উচুতে উঠিয়ে ১০-১২টি বর্শা ফলকের সাহায্যে তুলে এ গেটের ভিতরে নিক্ষেপ কর। হয় আমি

দুশমনদের হাতে শহীদ হয়ে যাব অথবা ভিতরে গিয়ে তোমাদের জন্য এ বাগানের গেট খুলে দেব।

দেখতে না দেখতেই বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী (রা.) উন্মুক্ত তরবারি হাতে তার ঢালটির উপর বসে পড়লেন। অত্যন্ত হালকা পাতলা ও ছিফ ছিফে আনসার যুবক বারা'আকে কয়েকজনে খুব সহজেই ঢালে বসিয়ে মাথার উপর তুলে নিলেন এবং সাথে সাথে অণ্য কয়েকজন বর্শাধারী তাদের বর্শা ফলকে তাকে উপরে তুলে গেটের ভিতরে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের হাজার হাজার অনুগত যোদ্ধাদের মাঝে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। বারা'আ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মাঝে বজ্রপাতের ন্যায় লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে গেট রক্ষী বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তলোয়ার, বর্শা এবং তীরের উপর্যুপরি আঘাত তার গোটা দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল; কিন্তু বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী (রা.) তাদের গেট রক্ষী বেষ্টনীর দশজনকে হত্যা করে পরিশেষে গেট খুলে দিতে সমর্থ হলেন।

এদিকে সাথে সাথে অপেক্ষমান বীর মুসলিম যোদ্ধারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বাধভাঙ্গা স্রোতের মতো ভিতরে ঢুকতে শুরু করলেন। যা ছিল এক নজীর বিহীন ভয়াল চিত্র। মুহূর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বাহিনী প্রাণ ভয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগল আর মুসলিম যোদ্ধারা এ সুযোগে তাদেরকে দলে দলে নিঃশেষ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের অবশিষ্ট বিশ হাজার সৈন্যের কবর রচনা করে তার দেহরক্ষী বাহিনীসহ তাকে ঘিরে ফেলে সবাইকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলো। সমস্ত বাগান বিশ হাজার মুরতাদের লাশের স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।

অন্যদিকে এই দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী (রা.) এ গেট খুলতে গিয়ে আশিটির অধিক তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন, তাঁকে বিশেষ চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসা তাবুতে প্রেরণ করা হলো। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দীর্ঘ একমাস ধরে নিজে বারা'আ (রা.) খিদমতে নিয়োজিত থাকলেন। ধীরে ধীরে বারা'আ (রা.) সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মহান ত্যাগ এবং কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন তারই হাতে মুসলমানদের এ যুদ্ধে বিজয় দান করে জাযীরাতুল আরবকে চিরদিনের জন্য ভণ্ডনবী ও মুরতাদের হাত থেকে পবিত্র করলেন।

তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা যে, তিনি যেন শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হতে পারেন। সর্বশেষ তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের তুস-তর কেল্লা বিজয়ের জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। এই তুসতর কেল্লা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের জন্যে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দু'আ কবুল করে নেন। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি শত্রুর তরবারির আঘাতে শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন। বহু আকাঙ্খিত শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যের পথ রচনা করে পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে প্রেরণা সৃষ্টি করে যান।

জীবন্ত শহীদ হযরত তালহা (রাঃ)

ওহুদের ময়দানে নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে সুস্পষ্ট বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা কোনো অবস্থাতেই যেন গিরি পথ থেকে সরে না আসেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তাদের একদল বলছিল, রাসূলের (সা.) আদেশ বলবৎ ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত। সুতরাং এখন বিজয় অর্জিত হয়েছে, এখন আর এখানে প্রহরা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আরেক দলের অভিমত ছিল, যুদ্ধে জয়-পরাজয় বলে নয়, রাসূলের (সা.) পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরা যাবে না।

এ ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবা স্থান ত্যাগ করে সরে এসেছিলেন। এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ বাহিনী অরক্ষিত সেই গিরি পথেই আক্রমণ করেছিল। তাদের আক্রমণে ওহুদের রণপ্রান্তরে মুসলিম বাহিনী চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের রক্তে ওহুদের প্রান্তরে যেন প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া।

সাহাবায়ে কেরাম তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে (সা.) ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের আঘাত রাসূলের (সা.) পবিত্র শরীরে যেন না

লাগে, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে (সা.) ঘিরে মানববন্ধন তৈরি করে নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর রাসূলকে (সা.) হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ শাহাদাত বরণ করলন। কাফির বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করছিল।

এ সময় কাফিরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে অবস্থান করে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। 'আল্লাহর নবী তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন হে সা'দ! তোমার ওপর আমার মাতা পিতা কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও।' হযরত আবু দুজানা আল্লাহর নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সমস্ত আঘাত তাঁর দেহেই লাগে এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে নবীর ওপর আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমণ এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না। এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'আক্রমণের মুখে শত্রুদেরকে যে পিছু হটাতে বাধ্য করবে সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।'

হযরত তালহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি শত্রুদেরকে আক্রমণ করবো।' আল্লাহর নবী (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি আক্রমণ করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সেই পূর্বের ঘোষণা দিলেন। হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পুনরায় এগিয়ে এলেন। এবারও আল্লাহর নবী তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত তালহাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। হযরত তালহা সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই পাপিষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। হযরত তালহা আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে গিয়ে নিজের একটি হাত হারালেন। তিনি রক্তাক্ত দেহে এক হাতেই তরবারি ধারণ করে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহর নবী (সা.) তাঁর কাঁধে, কাফিরদের আঘাতে নিজের এক হাত বিচ্ছিন্ন। একটি মাত্র হাত দিয়ে তরবারি চালনা করে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছেন এবং রাসূলকে (সা.) নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছেন। চরমভাবে আহত অবস্থায় একজন মানুষকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা এবং শত্রুকে প্রতিহত করা ছিলো খুবই কঠিন ব্যাপার। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিজের দেহের প্রতি লক্ষ্য ছিলো না। তাঁর দেহ থেকে তখন অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন আল্লাহর নবীকে (সা.) হেফাজত করতে হবে। এক সময় তিনি আল্লাহর নবীকে (সা.) নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌঁছে নবীকে (সা.) কাঁধ থেকে নামিয়েই জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি আর হজরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবী (সা.) এর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বলেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা দেখলাম তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শরীর থেকে একটি হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ৮০টিরও বেশি আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। নবী (সা.)-কে হেফাজত করতে গিয়েই তিনি তাঁর হাত হারিয়েছিলেন এবং এতগুলো আঘাত সহ্য করেছিলেন।

আল্লাহর নবী (সা.) পরবর্তীকালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোনো মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।' হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হতো। ওহুদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবুবকর (রা.) বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত তালহা (রা.)। নবী করীম (সা.) হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

হযরত হানযালা (রা.) এর শাহাদাত

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে প্রথমে যোগ দিতে পারেননি। তিনি ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। কথিত আছে সুন্দরী তন্বী-তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল (সা.) বাতিল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারি হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে নবী করীম (সা.) শহীদানদের দাফন করছেন। এমন সময় হজরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সদ্য বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে (সা.) জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল না দিয়ে দাফন করবেন না।'

নবী করীম (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নবীকে (সা.) অবগত করলেন, ইয়া রাসূল (সা.)! হানযালাকে গোছল দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশি হয়েছেন যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে গোছল করিয়েছেন।' রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হজরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধযুক্ত পানি ঝরছে। পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হজরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.) এর শাহাদাত

হযরত আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নব্বীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর (সা.) এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে তাঁর সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তিনি নবী করীম (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে দিচ্ছে না। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবো।'

নবী করীম (সা.) তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, ''আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদান করেছেন।" এরপর তিনি হযরত আমরের সন্তানদের বললেন, ''তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা না দিলেও পারো। আল্লাহ তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রাখতে পারেন।''

হযরত আমরের সন্তানগণ ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি ভাবলেন, তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাতবরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

হযরত আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলামবিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশপাশেই তাঁর সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে তাঁর এক সন্তান শাহাদাতবরণ করলেন। কাফিরদের শাণিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত আমরের স্ত্রী তাঁর স্বামী এবং সন্তানের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে রাসূলের (সা.) সামনে ওহুদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে নিতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। রাসূলকে (সা.) এ কথা জানানোর পর তিনি হযরত আমরের (রা.) স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিল?'

হযরত আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।' এ কথা শোনার পর আল্লাহর নবী (সা.) বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়ানে শুইয়ে দাও।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, এ সময় হজরত আইয়ুব আনসারী বার্ধক্যের দ্বার অতিক্রম করছিলেন। অথচ তিনি এ যুদ্ধের সময় দ্বীনের বিজয় ও ইসলামের গৌরবের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়েছিলেন।

কেউ কেউ মনে করেন সাহাবীদের উপর জুলুম নির্যাতন কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে হয়েছে। আজকের সময়ে তো ঐ পরিস্থিতি নেই। কিন্তু তারা জানে না এই পথের পথিকদের কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থা মোকাবিলা করতে হবে তার কয়েকটি উদাহরণ-

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম আবু হানিফা যালিম শাসকের অধীনে প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় খলিফা আবুল মুনসুর ইমাম আবু হানিফাকে ৩০টি বেত্রাঘাত করে জখম করে এবং তাকে এক হাজার দিরহাম দিলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাকে চাবুকাঘাত, নজরবন্দী করে আটকে রাখে। পরে জেলখানায় বিষপানে তাকে হত্যা করা হয়।

ইমাম মালেক (রহ.)

খলিফা মুনসুরের চাচাতো ভাই মদীনার গভর্নর জাফরের নির্দেশে ইমাম মালেক থেকে কথামতো ফতোয়া আদায় করতে না পেরে দেহের কাপড় খুলে তাকে চাবুকাঘাত করে এবং তাঁর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে উটের ওপর বসিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে খলিফা মামুনের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে খলিফার মৃত্যুর খবর আসে। পরবর্তীতে মুতাসিমের সময় ইমামকে চারটি ভারী বেড়ি পরিয়ে

রমজান মাসে রোদে বসিয়ে চাবুকাঘাত করা হয়। তিনি সংজ্ঞাহীন হলে তলোয়ার ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ৭২০ হিজরিতে ফতোয়া দেয়াকে কেন্দ্র করে একাধিকবার নজরবন্দী ও কারাবরণ করতে হয়েছে। কারাগারে বসেও তিনি লেখনী চালাতে থাকেন অতি দ্রুত বেগে। তাঁর সত্য প্রকাশে কারাপ্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে চায়। এবার রাজার হুকুমে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা, কলম, কালি দোয়াত সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তিনি দমেননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লিখতে থাকেন। এভাবে সত্যের নির্ভীক সেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে।

শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রহ.)

১৯৪৫ সালে জামাল আব্দুল নাসের ও ইংরেজদের মধ্যে দেশবিরোধী চুক্তি হয়। ইখওয়ান এ চুক্তির বিরোধিতা করলে চালানো হয় দমন-নিপীড়ন ও নির্যাতন। কয়েক সপ্তাহে সাইয়েদ কুতুবসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে কারাবন্দী করা হয়। জ্বরে আক্রান্ত কুতুবকে চালানো হয় ৬ ঘণ্টার সশস্ত্র অমানবিক নির্যাতন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর কামড়িয়ে সাইয়েদ কুতুবকে এদিক সেদিক নিয়ে যেত। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ৭ ঘণ্টার রিমান্ডে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তাকে। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেয়া হয়। মাথার ওপর উত্তপ্ত গরম পানি দিয়ে আবার ঢালা হতো বরফ। পুলিশের লাথি আর ঘুষি ছিলো নিত্যদিনের জুলুম। এক বছর পর প্রস্তাব দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে এই বলে যদি আপনি ক্ষমা চেয়ে কয়েকটি লাইন লিখে দেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। তাহলে আপনাকে মুক্তি দেয়া হবে।

সাইয়েদ কুতুব জবাব দিলেন, 'আমার অবাক লাগে যে, এ সকল লোক মজলুমকে বলছে জালিমের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে। আল্লাহর শপথ! যদি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের ফলে আমাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নাজাত দেয় তবু আমি তা বলতে প্রস্তুত নই। আমি আমার রবের দরবারে এমনভাবে হাজির হতে চাই যে, আমি তার ওপর সন্তুষ্ট আর তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট।

জেলখানায় যখন তাকে ক্ষমা চাইতে বলা হতো তখন তিনি বলতেন, যদি আমাকে কারাবন্দী করা সঠিক হয় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি অন্যায়ভাবে আমাকে আটক রাখা হয় তাহলে আমি জালিমের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইতে রাজি নই। এরপর তাকে সরকার শিক্ষামন্ত্রীর পদ দিতে টোপ দেয়। তিনি বলেন, আমি দুঃখিত। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সেই পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ মিসরের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর এখতিয়ার দেয়া না হবে। ইখওয়ানের কর্মীদের পেট্রল ঢেলে আগুনে নিক্ষেপ, শরীরে সিগারেটের আগুন ও লোহার শেকলে বেঁধে বৈদ্যুতিক শক, উলঙ্গ করে ভাইয়ের সামনে বোনকে নির্যাতন করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ২৮ আগস্ট রাতে সাইয়েদ কুতুব ও তার সঙ্গী মুহাম্মদ হাওয়াল এর ভোররাতে ফাঁসি কার্যকর করা হলো। ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.)

মাওলানা মওদূদী (রহ.) কে ১৯৪৮ সালে ৪ঠা অক্টোবর পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে।

অনেকবার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। আবার আন্দোলনের মুখে মুক্তও হয়েছেন। মাওলানা মওদূদী (রহ.) "কাদিয়ানি সমস্যা" শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনার জন্য সামরিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। এ বইটি তখন বাজারে বিক্রি হয়েছে এখনো হচ্ছে বইটিও বেআঈনী হয়নি। মাওলানা মওদূদীকে যখন উক্ত আদেশ শোনানো হয়, তিনি তখন শান্ত। ফাঁসির সেলে নিজেই হেঁটে যান। মাওলানা মওদূদীকে প্রাণভিক্ষা করার কথা বলা হলো। তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আপনারা মনে রাখবেন আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি কিছুতেই তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব না এবং আমার পক্ষে অন্য কেউ যেন প্রাণভিক্ষা না চায়। না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ।

কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, জমিনে নয়।" তিনি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হন। এই আদেশ রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে সরকার তখন ফাঁসির আদেশ কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে। তারপরও বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার মাওলানা মওদূদীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়

মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। কিন্তু যখন কোনো সংকটকাল আসে, তখন আসল ও মেকীর পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খন্দক যুদ্ধ এই কাজটিই করেছে। মদীনার মুসলমানদের দলে এক বিরাট সংখ্যক মুনাফিক ও মেকী ঈমানদার ঢুকে পড়েছিলো। তাদের সত্যিকার পরিচয়টা সাধারণ মুসলমানদের সামনে উদঘাটন করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই কাজে বিরোধীদের সকল বাধার পরও তার বান্দাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন রোমও পারস্য সামাজ্যের কথা আল্লাহ নিজেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে বান্দাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য কিছু গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। এ ধরনের অসংখ্য গুনাবলীর কথা মহান আল্লাহ-তায়ালা ঘোষণা করেছেন। তারমধ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হল-

ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি

ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই সবর বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, অর্থসম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানি করা, এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর। কুরআনে বলা হয়েছে-

তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভালো করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস, ৫৪)

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, 'অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয়ই আলাহ্র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।' (সূরা আল মুমিন, ৫৫)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত আছে, "ধৈর্য্যশীল ছাড়া এ গুন আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না" (হামীম আস সাজদাহ- ৩৫)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ-ওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব মুছিবত এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান - ১৪৬)

মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, '(হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।" (সূরা আলে ইমরান - ১৮৬)

কুরআনে বর্ণিত আছে, "তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ হলে তারা খুশী হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চর্তুদিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।' (সূরা আলে ইমরান - ১২০)

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী বইয়ে ধৈর্য্যের চিত্রটি তুলে ধরেছেন এভাবে–

'ধৈর্যের অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সঙ্কল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবেচিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্তচিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না। দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙার কাজও করতে

হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যই তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থিরচিত্তে ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্য বেহতর কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উঁচিয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনোদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এ দিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে। এই পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজের কাপড়ে কোনো কাঁটা বিঁধলে কাপড়ের সেই অংশটি ছিঁড়ে কাঁটা গাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে।

নৈতিক চরিত্রই আমাদের উত্তম হাতিয়ার

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সফলতার ও ব্যর্থতার মানদণ্ড হিসেবে শুধুমাত্র দুনিয়ার সফলতাকেই উল্লেখ করেননি। বরং বান্দাহর সফলতা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন তার ক্ষেত্রে সে কতটুকু সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর। কিন্তু বস্তুবাদী জীবনদর্শনে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব পাওয়া না পাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ দুনিয়ায় যাকে যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে যে, আল্লাহ বলেন, 'তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।' (সূরা আল ফাজর- ১৫-১৬)

আমাদের কে অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সঙ্কল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন আমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবো তখনই আমাদের ওপর বর্ষিত হবে অনুগ্রহরাশি আর এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে নিজের মধ্যে সবর ও সহিষ্ণুতার শক্তি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নামাজ পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করার শক্তি।

দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ঈমানের অনিবার্য দাবি

একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ততই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মাহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি-তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিসত্তা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোনো শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্তপিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালোবাসা দান করতে পারে। বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে।

পরন্তু সে আরও প্রমাণ করবে যে বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোনো লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনাই একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন ও কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনোরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কূটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধেও প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এ জন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির ওপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন, 'মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।' (সূরা আল ইমরান - ১৩৯)

আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, 'হে ঈমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আলে ইমরান - ২০০)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্নিত আছে, '(হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।(সূরা আলে ইমরান - ১৮৬)

আল্লহ তায়ালার ওপরই তায়াক্কুল

যারা আল্লাহ তায়ালার উপরই তায়াক্কুল করে তারা দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তির পরোয়া করে না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যায়। যার পেছনে তার সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ার কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। তার জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টা তিনি কখনও নিষ্ফল হতে দেবেন না।

আল্লাহ বলেন, "(তাদের অবাধ্য আচরণে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না, তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করো।" (সূরা আশ শুআরা : ২১৭)

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।" সূরা আনকাবুত, ৫৯

তারা সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মত হারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোনো চিড় ধরায় না। লোভ লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে। তাড়াহুড়া করে

না। ভীত আতঙ্কিত হওয়া লোভ লালসা পোষণ করা এবং অসঙ্গত উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে তারা দূরে থাকে।

স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে। বিপদ আপদ ও সঙ্কট সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা-না টলে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোনো অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনাশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল না হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই প্রকৃত সবর নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা হুদ, ১১)

মুসলমানদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম নিপীড়ন কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থায় ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবেলা এবং আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদের নামাজে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে।

নামাজের মাধ্যমে সাহায্য কামনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্নিত আছে, "তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আগের রাসূলদের সাথে যা কিছু ঘটেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌছে গেছে।" (সূরা আল আন'আম-৩৪)

আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, "সবর ও নামাজ সহকারে সাহায্য নাও নিঃসন্দেহে নামাজ বড়ই কঠিন কাজ কিন্তু খোদাভীরুদের জন্য নয়।" (সূরা বাকারা-৪৫)

আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত পক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর।" (সূরা মুয্যাম্মিল ০৭)

মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন, ‘‘রাতের বেলায়ও তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ্ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।’’ (সূরা দাহর, ২৬)

আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণণা করেন, ‘‘(হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।’’ (সূরা আল ইমরান)

পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, ‘‘এই ভরসা করার কারণেই বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কত দুর্বল ছিলে; অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে।’’

প্রতিশোধ নয় সহনশীল হওয়া

ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়া ক্ষমতায় আসীন হওয়া মহান আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা। সময়ের উত্থান পতনে অনেক সময়ে ক্ষমতাসীন না হলেও ক্ষমতার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ আসে। তখন প্রতিশোধ নেয়ার একটা উদগ্র বাসনা মাঝে মধ্যে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ, নেয়ামতকে সমাজের মানুষের কল্যাণে না লাগিয়ে যারা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে ব্যস্ত তাদেরই প্রতিশোধের মানসিকতা স"ষ্টি হয়। এটা অবশ্যই পরিতাজ্য। আমরা প্রতিশোধ নয় ক্ষমা করব, প্রতিহিংসা নয় দরদ-ভালোবাসা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হৃদয় জয় করব ইনশাআল্লাহ।

রাসূলে পাকের (সা.) মক্কা বিজয়ের ইতিহাস দেখুন। রাসূল (সা.) ও তার সাথীদের দীর্ঘ দুই দশক ধরে নিকৃষ্টতম জুলুম-অত্যাচার পরিচালনাকারী ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, দেশ থেকে বিতাড়নকারী, বিনা উস্কানিতে আক্রমণকারী, মিথ্যা অভিযোগকারী, ইসলামের কট্টর শত্রুদের সমস্ত বর্বরতম অপরাধকেও মাফ করে দিলেন। মহান আল্লাহ এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল কুরআনে বললেন, “মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ করে, আল্লাহতায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে নিশ্চয়ই তিনি কখনো জালেমদের পছন্দ করেন না।’’ সূরা শুয়ারা ৪১;

"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে) অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজ সমূহের অন্যতম।" (সূরা শুয়ারা ৪২)

মনমগজের পরিবর্তন ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ ও কোমলতার মাধ্যমেই সম্ভবপর। ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আক্রোশ চরিতার্থ হওয়া ছাড়া কোনো লাভ হয় না। রাসূলের (সা.) জীবনে আমরা এ মহান গুণ দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন সুযোগ পাই তখন এসব ইতিহাস, মহানুভবতা ভুলে গিয়ে আক্রোশ, ক্রোধ চরিতার্থ করতে গিয়ে মূল আদর্শিক প্রভাব ও বিজয়কে নস্যাৎ করে ফেলি। ইসলামী আন্দোলনের ভাইবোনদের সকল অবস্থায় এদিকে খেয়াল রাখা দরকার। আমাদের এ ধরনের উদার ও মহৎ ব্যবহার অনেকের মন জয় করতে আকৃষ্ট করবে।

রিজিক অন্বেষণে সীমালংঘন না করা

বর্তমান আওয়ামী তথা ১৪ দলীয় সরকারের অব্যবস্থাপনা ও জুলুমের শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটাতে পারছে না। বহু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার অর্থনৈতিক স্ব"ছলতার প্রচেষ্টার দিক হারিয়ে ফেলে, যখন যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ধরতে চায়। হালাল হারামের সীমা খেয়াল রাখে না বা রাখার চেষ্টা করে না। সুদের কাজ কারবার লেনদেন, এমএলএম, মালটিপারপাস নামে বৈধ/অবৈধ অনেক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বাজারে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের মন আকৃষ্ট করে। ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের এ বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে অংশ নেয়া বা যোগদান করা উচিত। বিশ্বস্ত একজনকে ভালো অফিস ও ভাতা দিয়ে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বলে প্রচার চালিয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ গ্রহণ করে। কিছুদিন পরেই কোম্পানি লা পাত্তা হয়ে যায়। ধৈর্য ধরে আয় রোজগার, চাকরি, কর্মসংস্'ান চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মানুষের আমানত ব্যবহার করে যেন ফাঁদে না পড়ি তা অবশ্যই খেয়াল রেখে চলতে হবে।

মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত

বাতিলের মিথ্যা প্রচারণা, হামলা আর মামলা জেল জুলুম নির্যাতনের মোকাবিলায় সত্য পন্থীরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ বলেন, ''তোমাদের জন্যে সেই দু'টি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে

লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের। চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল, কাফেরেরা মু'মিনদের দ্বিগুন। কিন্তু ফলাফল (প্রমাণ করলো যে) আল্লাহ তার বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যাকে ইচ্ছা সহায়তা দান করেন। অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে।" (সূরা আল ইমরান-১৩)

পবিত্র কুরআনে বর্নিত আছে, "স্মরণ করো যখন তোমাদের দুটি দল কাপুরুষতার প্রদর্শনী করতে উদ্যোগী হয়েছিল অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্য বর্তমান ছিলেন এবং মু'মিনদের আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত। এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর না-শোকরী করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার তোমরা শোকর গুজার হবে। স্মরণ করো যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলেঃ আল্লাহ তার তিন হাজার ফেরেশতা নামিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্যি যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।" (সূরা আল ইমরান-১২২-১২৫)

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "প্রকৃত পক্ষে সত্য এই যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী।" (সূরা আল ইমরান-১৫০)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্নিত আছে, "আলাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহরই ওপরই ভরসা করা উচিত।" (সূরা আল ইমরান-১৬০)

যেভাবে নূহ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে

একমাত্র ঈমানদাররাই সফলকাম হবে। তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তোমরা সবর ও হিকমত সহকারে কাজকে অব্যাহত রাখো।

যারা আল্লাহভীরুতা ও নেকির পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে। কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা দীন ও ঈমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা জুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবেলা করবে।

আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়া

বিপদ মুসিবতের সময় সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে বান্দা তার মাবুদের কাছে গিয়ে হাজির হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''যে নিয়ামতই তোমরা পেয়েছ তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারপর যখন তোমাদের উপর কোনো কঠিন সময় আসে তখন তোমরা ফরিয়াদ নিয়ে তারই দিকে দৌড়াও।''

দোয়ার ফল কখনও দুনিয়াতে চোখে পড়ে আবার কখনও চোখে পড়ে না। তবে আখিরাতে তা দেখতে পাওয়া যাবে। তাই দোয়া করাকে গুরুত্বহীন ভাবা যেমনি ঠিক নয় অনুরুপভাবে দোয়ার ফল পেতে বিচলিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তায়লা সকল মু'মিনের দোয়া শোনেন। কার দোয়ার উত্তর কখন দেবেন তা তিনিই ভালো জানেন। তিনি তাঁর বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই করেন- এ বিশ্বাস সকল মুমিনকে রাখতে হবে।

তাই সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। মহান আল্লাহর রাসূল সা. ফরিয়াদ করেছেন, হে আল্লাহ আজ যদি মুসলমানেরা পরাজিত হয় তাহলে তোমার জমিনে তোমার ইবাদাত করবে কে?

তায়েফের ময়দানে রাসূল (সা.) দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিম্নের মর্মস্পর্শী দোয়াটা করলেন :- ''হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাই। দরিদ্র ও অক্ষমদের প্রতিপালক তুমিই। তুমিই আমার মালিক। তুমি আমাকে কার কাছে সঁপে দিতে চাইছ? আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, নাকি শত্রুর কাছে? তবে তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাক, তাহলে আমি

কোনো কিছুই পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পেলে সেটাই আমার জন্য অধিকতর প্রশান্তি। আমি তোমার কোপানলে অথবা আজাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তোমার সেই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তোষ ছাড়া আমি আর কিছু কামনা করি না। তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে কোনো শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।*

আজকের যুগেও আমাদেরকে কঠিন মুহূর্তে সদা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ জানাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।"

"বল আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রাহমান বলে- যে নামেই আহ্বান করো না কেন সব সুন্দর নাম তারই।"

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করলেও কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না"

আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার উত্তম সময় হচ্ছে, গভীর রাতে কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে কান্নাকাটি করা। মহান আল্লাহর রাসূল (সা.) গভীর রাতে সবসময় জেগে নামাজ আদায় করতেন। আর তা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ ছিল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যাক্তি কিছু সময় বাদ দিয়ে রাতের বেলা নামাজে দাড়িয়ে থাকুন। আধা রাত বা তার চেয়ে কিছু কম করুন। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি বাড়িয়ে নিন আর কুরআন খুব থেমে থেমে পড়ুন। নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক ভারী কথা নাযিল করব। আসলে রাত জাগা নফসকে দমন করার জন্যে খুব বেশি ফলদায়ক এবং কুরআন ঠিকমত পড়ার জন্য বেশি উপযোগী। দিনের বেলা তো আপনার জন্যে অনেক ব্যস্ততা আছে। আপনার রবের জিকর করুন সবকিছু থেকে

* মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (স:) - নঈম সিদ্দিকী।

আলাদা হয়ে তারই হয়ে থাকুন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব তাকেই নিজের উকিল অভিভাবক বানিয়ে নিন। আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে সবর করুন এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান।" (সুরা মুয্যাম্মিল)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমত সে চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়টি হলো সে চক্ষু যা শত্রুর প্রতীক্ষায় আল্লাহর পথে পাহারাদারি করে রাত কাটিয়েছে।" (তিরমিজি)

কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের দোয়া কেবল এতটুকু ছিলঃ 'হে আমাদের রব' আমাদের ভুল ক্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমালংঘিত হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা আল ইমরান - ১৪৭)

মানবতার কল্যাণে যে আন্দোলনের জন্ম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মহান আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার এক দ্বীনি কাফেলা। মূলত আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত জীবন বিধান কায়েমের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে এ সংগঠন। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য। জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে জামায়াতে ইসলামী সবসময় আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নানা ব্যর্থতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্র, সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি-এক কথায় দুঃশাসনের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আজ দেশের গণমানুষের অত্যন্ত জনপ্রিয় দল হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। দেশের রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে জামায়াতের এই জনপ্রিয়তা আর নেতৃত্বেও এই ক্লিন ইমেজ-ই যেন প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় চক্ষুশুলের কারণ।

তাছাড়া বিগত চারদলীয় জোটের সময় জামায়াতের দুই শীর্ষ নেতা ৩টি মন্ত্রণালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে যে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রতিপক্ষের জন্য তা ঈর্ষণীয় হয়ে দাড়িয়েছে। যারা আজীবন সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, যারা দেশের প্রতিটি নাগরিককে সততা দেশপ্রেম ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে আজ মানবতা বিরোধী আখ্যা দেয়া ইতিহাসের জঘন্য মিথ্যাচার নয় কি? যে দলটি দীর্ঘ ৪২ বছর আপনাদের পাশে থেকে দেশের মানুষের ঈমান আকীদা সংরক্ষণ, স্বাধীনতা সর্বভৌত্বের পক্ষে মজবুত প্রাচীর গড়ে তুলেছে, গভীর দেশপ্রেম নিয়ে জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নে, সততা, আন্তরিকতা সহকারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ঐতিহাসিক অবদানের জন্য যাদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করার কথা, সেখানে শুধু ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে আওয়ামী লীগ আজ রাষ্ট্রের সকল শক্তি নিয়োগ করে তাদের উপর পরিচালনা করছে ইতিহাসের বর্বর ও জঘন্যতম নির্যাতন। যা কোনো সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায় না। আজ এমন একটি আদর্শিক দলকে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে নিশ্চিন্ন করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে সরকার। জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীর উপর আওয়ামী লীগ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আজ নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। সারাদেশে গণগ্রেফতার এখনো চলছে। সারাদেশে পুলিশি হামলায় আহত হয়েছে কয়েক হাজার নেতাকর্মী। নিখোঁজ রয়েছে ৮০ নেতাকর্মী। পুলিশ-ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত অনেকেই।

এ ছাড়া সরকারের ৪৬ মাসের শাসনামলে জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রায় ২৫ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে প্রায় তিন হাজারের মতো। আসামি সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার । পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৬শ'। ছাত্রীদের মাঝ ইসলামী আদর্শ প্রচারের সংগঠন ইসলামী ছাত্রী-সংস্থা ও বোরকা পরা ছাত্রী মহিলাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয় প্রায় ১০০ জন। এদেরকে রিমান্ডে নিয়ে চালানো হয় শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন। এর থেকে রেহাই পায়নি বৃদ্ধ মহিলা ও অন্তসত্বা নারীও। তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করলেও জামিন না দিয়ে কারাগারে আবদ্ধ রাখা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লজ্মন। এমনকি বইয়ের দোকানে বই কিনতে এসে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পুলিশের হয়রানী এবং গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন পর্দানসীন ছাত্রীগণ।

অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের শতাধিক কার্যালয়ে। এ সরকারের আমলে খুন হয় জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের অজস্র নেতাকর্মী। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের দুইজন সম্ভাবনাময় নেতা আল-মুকাদ্দাস ও ওয়ালিউল্লাহকে গুম করা হয়। প্রায় ১০ মাস অতিবাহিত হলেও তাদের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। অসংখ্য নেতা-কর্মীকে শহীদ করা হয়েছে, জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে অনেককে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আজ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। গত নির্বাচনে জামায়াত কম আসন পেলেও মাত্র কয়েকটি আসনে নির্বাচন করে জামায়াত ভোট পেয়েছে প্রায় ৪৬ লাখ। এর আগের নির্বাচন থেকে এ নির্বাচনে প্রায় ৯ লাখ ২০ হাজার ভোট বেশি পেয়েছে। যেখানে নির্বাচন করেনি সেখানে জামায়াতের প্রায় ১৩ লাখ ভোট রয়েছে। জেলে নিয়ে হত্যা করে আহত করে এই সংখ্যাকে মিটিয়ে দেয়ার হীন ষড়যন্ত্র কার্যকর হবে না। মজলুমের বিজয় অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধাপরাধ ইস্যু এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক দল। দেশ গঠনে এ দলটি যথার্ত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। গত চার দলীয় জোট সরকারের আমলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিল সংগঠটির আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ। কিন্তু বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দূর্নীতি, লুটপাট, ইসলাম ও দেশ বিরোধী কর্মকান্ডের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করায় সরকার জামায়াত ও জামায়াত নেতৃবৃন্দের আদর্শিক মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে দমন-নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। তথাকথিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করে জামায়াত নেতৃত্বকে সাজা দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করেছে। এই বিচারের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা নিয়ে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞগণ প্রশ্ন তুলেছেন। দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সমালোচনার পরও সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে সাজা দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে জনমতকে উপেক্ষা করে বিচারের নামে নাটক মঞ্চস্থ করে যাচ্ছে। অথচ বিগত চল্লিশ বছর ধরে এই নেতৃবৃন্দের কারো নামে মামলাতো দূরে থাক বাংলাদেশের কোন থানায় একটি জিডি পর্যন্ত ছিল না।

বাংলাদেশের স্থপতি স্বয়ং যুদ্ধাপরাধ ইস্যুর চূড়ান্ত মীমাংসা করে গেছেন

শেখ সাহেবের সরকার তদন্তের মাধ্যমে পাক সেনা বাহিনী ও সহযোগী বাহিনীর মধ্য থেকে ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তালিকাভূক্ত করেন। তাদের বিচার করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই জাতীয় সংসদে পাশ করে International crimes (Tribunal) act। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে ঐ যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করা হয়। শেখ সাহেব বাংলাদেশের কোনো বেসামরিক ব্যাক্তিকে যুদ্ধাপরাধের তালিকায় শামিল করেননি। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি, যারা মুক্তিযুদ্ধে বর্বরতা চালিয়েছিল এবং যারা সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়েছিল তাদেরকে শেখ সাহেবের সরকার কলাবোরেট আখ্যা দিয়ে ছিলেন।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সেনাবাাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে সামরিক সরকার এক আদেশের মাধ্যমে জনগণ থেকে রাজাকার, আলবদর, আলসামস নামে বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে। এসব বাহিনীকেও শেখ সাহেবের সরকার কলাবোরেটর আখ্যা দেয়। কলাবোরেটদের বিচার করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৪ জুন কলাবোরের্টস অর্ডার নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল ৩৭৪৭১ জনের বিরুদ্ধে, এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪৬২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কোনো মামলা দায়ের সম্ভব হয়নি। মাত্র ২৮৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭৫২ জনকে সাজা দেয়া হয়। এবং অবশিষ্ট ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে নভেম্বরে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর গ্রেফতারকৃত ও সাজাপ্রাপ্ত সকলেই মুক্তি পায়। অবশ্য যারা হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধী তাদেরকে ঐ আইনে বিচার করার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখা হয়। কিন্ত এরপর দু'বছর পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগে মামালা দায়ের না হওয়ায় এ আইন বিলুপ্ত করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে সেময় অভিযোগ উঠেনি, কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি (অথচ

তখন সাক্ষী প্রমাণ তাজা পাওয়া যেত) সেই নিরপরাধীদেরকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় যুদ্ধাপরাধী সাজাবার জন্য ৪০ বছর পরে এখন মামলার সাক্ষী তালাশ করা হচ্ছে।

যেহেতু যুদ্ধপরাধী বিচারের আইন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাই বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ আইনবীদরা বাংলাদেশের এ আইনের ক্রুটি উল্লেখ করে সংশোধনী দিয়েছেন সরকার তা গ্রহণ না করে বলল এটা যুদ্ধপরাধ বিচার নয় মানবতা বিরোধী বিচার। অথচ মানবতা বিরোধী বিচারের জন্য আমাদের দেশে প্রচলিত আইনই যথেষ্ঠ। এ সরকারের আমলে নিজ দলের যেসব লোক দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে, বিরোধীদল, বিশ্বজিৎ, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনীসহ যে সব নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের সাক্ষীসাবুদ এখনো তাজা, যদি মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতেই হয় তাহলে এগুলোর বিচার আগে করা উচিত যা করছে না সরকার।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের আড়ালে দীর্ঘ ৪২ বছরের ঐহিত্যবাহী দলটির শীর্ষ নেতাদের নানাভাবে চরিত্র হননের চেষ্টা করা হচ্ছে। লুটপাট, দখলদারিত্ব এবং সর্বপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে দেশ বিকিয়ে দেয়ার আয়োজনকে বাধাহীন করতেই সরকার চাইছে ইসলামী ভাবাদর্শে গড়া দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী জামায়াতে ইসলামীকে নিশ্চিহ্ন করতে। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের উপর অত্যাচার হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে, নিপীড়ন হয়েছে নানা ভাবে, নানা কৌশলে। বার বার থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে। কিন্তু কোনো দলন নিপীড়নই ইসলামী আন্দোলনের পথচলা থামিয়ে দিতে পারেনি, পারবেও না ইনশাআল্লাহ। গুম, আর খুনের কালো কাপড়ে আজ বাংলার আকাশ ঢাকা। সন্তান হারা বাবা-মায়ের বিনিদ্র রজনীর চোখের পানি, আর কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী মজলুমের ফরিয়াদ কখনো বৃথা যাবে না।

উপসংহার : পৃথিবীতে হক ও বাতিলের সংঘাত অনিবার্য। সত্যপন্থীদের অবশ্য দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তার উপর ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, বিপদ-মসিবত, সমস্যা ও সঙ্কটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে যা কেবল মাত্র ঐ কঠিন বিপদসঙ্কুল গিরিপথেই লালিত হতে পারে। তাদেরকে শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে সবরকারী বলে প্রমাণ করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য যথাসময়ে তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য এগিয়ে আসবে। সত্যপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্রের পথ মাড়িয়ে তার সন্তুষ্টির পথে টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুন, আমীন।